

সুভা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[লেখক-পরিচিতি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৫শে বৈশাখ ১২৬৮ সালে (৭ই মে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। বাল্যকালেই তাঁর কবিপ্রতিভার উন্মেষ ঘটে। মাত্র পনেরো বছর বয়সে তাঁর বনফুল কাব্য প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি *Gitanjali: Song Offerings* সংকলনের জন্য এশীয়দের মধ্যে সাহিত্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বস্তুত তাঁর একক সাধনায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সকল শাখায় দ্রুত উন্নতি লাভ করে এবং বিশ্বদরবারে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, সুরকার, নাট্য প্রযোজক ও অভিনেতা। কাব্য, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, গান ইত্যাদি সাহিত্যের সকল শাখাই তাঁর অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে। তাঁর অজস্র রচনার মধ্যে *মানসী*, *সোনার তরী*, *চিত্রা*, *কল্পনা*, *ক্ষণিকা*, *বলাকা*, *পুনশ্চ*, *চোখের বালি*, *গোরা*, *ঘরে বাইরে*, *যোগাযোগ*, *শেষের কবিতা*, *বিসর্জন*, *ডাকঘর*, *রক্তকরবী*, *গল্পগুচ্ছ*, *বিচিত্র প্রবন্ধ* ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮ সালে (৭ই আগস্ট ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দ) কলকাতায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।]

মেয়েটির নাম যখন সুভাষিনী রাখা হইয়াছিল তখন কে জানিত সে বোবা হইবে। তাহার দুটি বড়ো বোনকে সুকেশিনী ও সুহাসিনী নাম দেওয়া হইয়াছিল, তাই মিলের অনুরোধে তাহার বাপ ছোটো মেয়েটির নাম সুভাষিনী রাখে। এখন সকলে তাহাকে সংক্ষেপে সুভা বলে।

দস্তুরমতো অনুসন্ধান ও অর্থব্যয়ে বড়ো দুটি মেয়ের বিবাহ হইয়া গেছে, এখন ছোটোটি পিতামাতার নীরব হৃদয়ভারের মতো বিরাজ করিতেছে।

যে কথা কয় না সে যে অনুভব করে ইহা সকলের মনে হয় না, এইজন্য তাহার সাক্ষাতেই সকলে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দৃষ্টিস্তা প্রকাশ করিত। সে যে বিধাতার অভিশাপস্বরূপে তাহার পিতৃগৃহে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে এ কথা সে শিশুকাল হইতে বুঝিয়া লইয়াছিল। তাহার ফল এই হইয়াছিল, সাধারণের দৃষ্টিপথ হইতে সে আপনাকে গোপন করিয়া রাখিতে সর্বদাই চেষ্টা করিত। মনে করিত, আমাকে সবাই ভুলিলে বাঁচি। কিন্তু, বেদনা কি কেহ কখনো ভোলে? পিতামাতার মনে সে সর্বদাই জাগরুক ছিল।

বিশেষত, তাহার মা তাহাকে নিজের একটা ক্রটিস্বরূপ দেখিতেন; কেননা, মাতা পুত্র অপেক্ষা কন্যাকে নিজের অংশরূপে দেখেন—কন্যার কোনো অসম্পূর্ণতা দেখিলে সেটা যেন বিশেষরূপে নিজের লজ্জার কারণ বলিয়া মনে করেন। বরঞ্চ, কন্যার পিতা বাণীকণ্ঠ সুভাকে তাহার অন্য মেয়েদের অপেক্ষা যেন একটু বেশি ভালোবাসিতেন; কিন্তু মাতা তাহাকে নিজের গর্ভের কলঙ্ক জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি বড়ো বিরক্ত ছিলেন। সুভার কথা ছিল না, কিন্তু তাহার সুদীর্ঘপল্লববিশিষ্ট বড়ো বড়ো দুটি কালো চোখ ছিল—এবং তাহার ওষ্ঠাধর ভাবের আভাসমাত্রে কচি কিশলয়ের মতো কাঁপিয়া উঠিত।

কথায় আমরা যেভাবে প্রকাশ করি সেটা আমাদের অনেকটা নিজের চেষ্টায় গড়িয়া লইতে হয়, কতকটা তর্জমা করার মতো; সকল সময়ে ঠিক হয় না, ক্ষমতার অভাবে অনেক সময়ে ভুলও হয়। কিন্তু কালো চোখে কিছু তর্জমা করিতে হয় না—মন আপনি তাহার উপরে ছায়া ফেলে; ভাব আপনি তাহার উপরে কখনো প্রসারিত কখনো মুদিত হয়, কখনো উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া উঠে, কখনো স্নানভাবে নিবিয়া আসে, কখনো অন্তর্যমিত চন্দ্রের মতো অনিমেষভাবে চাহিয়া থাকে, কখনো দ্রুত চঞ্চল বিদ্যুতের মতো দিগ্বিদিকে ঠিকরিয়া উঠে। মুখের ভাব বৈ আজন্মকাল যাহার অন্য ভাষা নাই তাহার চোখের ভাষা অসীম উদার এবং অতলস্পর্শ গভীর—অনেকটা স্বচ্ছ আকাশের মতো, উদয়াস্ত এবং ছায়ালোকের নিস্তরঙ্গ রঙ্গভূমি। এই বাক্যহীন মানুষের মধ্যে বৃহৎ প্রকৃতির মতো একটা বিজন মহত্ত্ব আছে। এইজন্য সাধারণ বালকবালিকারা তাহাকে একপ্রকার ভয় করিত, তাহার সহিত খেলা করিত না। সে নির্জন দ্বিপ্রহরের মতো শব্দহীন এবং সঙ্গীহীন।

গ্রামের নাম চণ্ডীপুর। নদীটি বাংলাদেশের একটি ছোটো নদী, গৃহস্থঘরের মেয়েটির মতো, বহুদূর পর্যন্ত তাহার প্রসার নহে; নিরলসা তব্বী নদীটি আপন কূল রক্ষা করিয়া কাজ করিয়া যায়; দুই ধারের গ্রামের সকলেরই সঙ্গে তাহার যেন একটা-না-একটা সম্পর্ক আছে। দুই ধারে লোকালয় এবং তরুচ্ছায়াঘন উচ্চ তট; নিম্নতল দিয়া গ্রামলক্ষ্মী স্রোতস্বিনী আত্মবিস্মৃত দ্রুত পদক্ষেপে প্রফুল্ল হৃদয়ে আপনার অসংখ্য কল্যাণকার্যে চলিয়াছে।

বাণীকণ্ঠের ঘর নদীর একেবারে উপরেই। তাহার বাঁখারির বেড়া, আটচালা, গোয়ালঘর, টেকিশালা, খড়ের স্তূপ, তেঁতুলতলা, আম কাঁঠাল এবং কলার বাগান নৌকাবাহী-মাএরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই গার্হস্থ্য সচ্ছলতার মধ্যে বোবা মেয়েটি কাহারও নজরে পড়ে কি না জানি না, কিন্তু কাজকর্মে যখনই অবসর পায় তখনই সে এই নদীতীরে আসিয়া বসে।

প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়। যেন তাহার হইয়া কথা কয়। নদীর কলধ্বনি, লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখির ডাক, তরুর মর্মর—সমস্ত মিশিয়ে চারিদিকের চলাফেরা-আন্দোলন-কম্পনের সহিত এক হইয়া সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায় বালিকার চিরনিস্তরঙ্গ হৃদয়-উপকূলের নিকটে আসিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে। প্রকৃতির এই বিবিধ শব্দ এবং বিচিত্র গতি, ইহাও বোবার ভাষা—বড়ো বড়ো চক্ষুপল্লববিশিষ্ট সুভার যেভাষা তাহারই একটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার; বিপ্লববর্ণন তৃণভূমি হইতে শব্দাতীত নক্ষত্রলোক পর্যন্ত কেবল ইঙ্গিত, ভঙ্গি, সংগীত, ক্রন্দন এবং দীর্ঘনিশ্বাস।

এবং মধ্যাহ্নে যখন মাঝিরা জেলেরা খাইতে যাইত, গৃহস্থেরা ঘুমাইত, পাখিরা ডাকিত না, খেয়া-নৌকা বন্ধ থাকিত, সজন জগৎ সমস্ত কাজকর্মের মাঝখানে সহসা থামিয়া গিয়া ভয়ানক বিজনমূর্তি ধারণ করিত, তখন রুদ্ধ মহাকাশের তলে কেবল একটি বোবা প্রকৃতি এবং একটি বোবা মেয়ে মুখামুখি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত—একজন সুবিস্তীর্ণ রৌদ্রে, আর-একজন ক্ষুদ্র তরুচ্ছায়ায়।

সুভার যে গুটিকতক অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল ছিল না তাহা নহে। গোয়ালের দুটি গাভী, তাহাদের নাম সর্বশী ও পান্ডুলি। সে নাম বালিকার মুখে তাহারা কখনো শুনে নাই, কিন্তু তাহার পদশব্দ তাহারা চিনিত— তাহার কথাহীন একটা করুণ সুর ছিল, তাহার মর্ম তাহারা ভাষার অপেক্ষা সহজে বুঝিত। সুভা কখন তাহাদের আদর করিতেছে, কখন ভর্ৎসনা করিতেছে, কখন মিনতি করিতেছে, তাহা তাহারা মানুষের অপেক্ষা ভালো বুঝিতে পারিত।

সুভা গোয়ালে ঢুকিয়া দুই বাহুর দ্বারা সর্বশীর গ্রীবা বেঁটন করিয়া তাহার কানের কাছে আপনায় গওদেশ ঘর্ষণ করিত এবং পান্ডুলি স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া তাহার গা চাটিত। বালিকা দিনের মধ্যে নিয়মিত তিনবার করিয়া গোয়ালঘরে যাইত, তাহা ছাড়া অনিয়মিত আগমনও ছিল; গৃহে যেদিন কোনো কঠিন কথা শুনিত সেদিন সে অসময়ে তাহার এই মূক বন্ধু দুটির কাছে আসিত— তাহার সহিষ্ণুতাপরিপূর্ণ বিষাদশান্ত দৃষ্টিপাত হইতে তাহারা কী একটা অন্ধ অনুমানশক্তির দ্বারা বালিকার মর্মবেদনা যেন বুঝিতে পারিত, এবং সুভার গা ঘেঁষিয়া আসিয়া অঙ্গে অঙ্গে তাহার বাহুতে শিং ঘষিয়া ঘষিয়া তাহাকে নির্বাক ব্যাকুলতার সহিত সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিত।

ইহারা ছাড়া ছাগল এবং বিড়ালশাবকও ছিল; কিন্তু তাহাদের সহিত সুভার এরূপ সমকক্ষভাবে মৈত্রী ছিল না, তথাপি তাহারা যথেষ্ট আনুগত্য প্রকাশ করিত। বিড়ালশিশুটি দিনে এবং রাতে যখন-তখন সুভার গরম কোলটি নিঃসংকোচে অধিকার করিয়া সুখনিদ্রার আয়োজন করিত এবং সুভা তাহার গ্রীবা ও পৃষ্ঠে কোমল অঙ্গুলি বুলাইয়া দিলে যে তাহার নিদ্রাকর্ষণের বিশেষ সহায়তা হয়, ইঙ্গিতে এরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিত।

উন্নত শ্রেণির জীবের মধ্যে সুভার আরও একটি সঙ্গী জুটিয়াছিল। কিন্তু তাহার সহিত বালিকার ঠিক কিরূপ সম্পর্ক ছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন, কারণ, সে ভাষাবিশিষ্ট জীব; সুতরাং উভয়ের মধ্যে সমভাষা ছিল না।

পৌসাইদের ছোটো ছেলেটি— তাহার নাম প্রতাপ। লোকটি নিতান্ত অকর্মণ্য। সে যে কাজকর্ম করিয়া সংসারের উন্নতি করিতে যত্ন করিবে, বহু চেষ্টার পর বাপ-মা সে আশা ত্যাগ করিয়াছেন। অকর্মণ্য লোকের একটা সুবিধা এই যে, আত্মীয় লোকেরা তাহাদের উপর বিরক্ত হয় বটে, কিন্তু প্রায় তাহারা নিঃসম্পর্ক লোকদের প্রিয়পাত্র হয়— কারণ, কোনো কার্যে আবদ্ধ না থাকতে তাহারা সরকারি সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়। শহরের যেমন এক-আধটা গৃহসম্পর্কহীন সরকারি বাগান থাকা আবশ্যিক তেমনি গ্রামে দুই-চারিটা অকর্মণ্য সরকারি লোক থাকার বিশেষ প্রয়োজন। কাজে-কর্মে আমোদে-অবসরে যেখানে একটা লোক কম পড়ে সেখানেই তাহাদিগকে হাতের কাছে পাওয়া যায়।

প্রতাপের প্রধান শখ— ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরা। ইহাতে অনেক সময় সহজে কাটানো যায়। অপরাহ্নে নদীতীরে ইহাকে প্রায় এই কাজে নিযুক্ত দেখা যাইত। এবং এই উপলক্ষে সুভার সহিত তাহার প্রায় সাক্ষাৎ হইত। যে-কোনো কাজেই নিযুক্ত থাক, একটা সঙ্গী পাইলে প্রতাপ থাকে ভালো। মাছ ধরার সময় বাক্যহীন সঙ্গীই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ— এইজন্য প্রতাপ সুভার মর্যাদা বুঝিত। এইজন্য, সকলেই সুভাকে সুভা বলিত, প্রতাপ আর-একটু অতিরিক্ত আদর সংযোগ করিয়া সুভাকে ‘সু’ বলিয়া ডাকিত।

সুভা তেঁতুলতলায় বসিয়া থাকিত এবং প্রতাপ অনতিদূরে ছিপ ফেলিয়া জলের দিকে চাহিয়া থাকিত। প্রতাপের জন্য একটি করিয়া পান বরাদ্দ ছিল, সুভা তাহা নিজে সাজিয়া আনিত। এবং বোধ করি অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া চাহিয়া ইচ্ছা করিত, প্রতাপের কোনো-একটা বিশেষ সাহায্য করিতে, একটা-কোনো কাজে লাগিতে, কোনোমতে জানাইয়া দিতে যে এই পৃথিবীতে সেও একজন কম প্রয়োজনীয় লোক নহে। কিন্তু কিছুই করিবার ছিল না। তখন সে মনে মনে বিধাতার কাছে অলৌকিক ক্ষমতা প্রার্থনা করিত— মন্ত্রবলে সহসা এমন একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটাইতে ইচ্ছা করিত যাহা দেখিয়া প্রতাপ আশ্চর্য হইয়া যাইত, বলিত, ‘তাই তো, আমাদের সুভির যে এত ক্ষমতা তাহা তো জানিতাম না।’

মনে করো, সুভা যদি জলকুমারী হইত; আস্তে আস্তে জল হইতে উঠিয়া একটা সাপের মাথার মণি ঘাটে রাখিয়া যাইত; প্রতাপ তাহার তুচ্ছ মাছধরা রাখিয়া সেই মানিক লইয়া জলে ডুব মারিত; এবং পাতালে গিয়া দেখিত, রূপার অটালিকায় সোনার পালঙ্কে— কে বসিয়া?— আমাদের বাণীকণ্ঠের ঘরের সেই বোবা মেয়ে সু— আমাদের সু সেই মণিদীপ্ত গভীর নিস্তন্ধ পাতালপুরীর একমাত্র রাজকন্যা। তাহা কি হইতে পারিত না, তাহা কি এতই অসম্ভব। আসলে কিছুই অসম্ভব নয়, কিন্তু তবুও সু প্রজাশূন্য পাতালের রাজবংশে না জন্মিয়া বাণীকণ্ঠের ঘরে আসিয়া জন্মিয়াছে এবং গোসাইদের ছেলে প্রতাপকে কিছুতেই আশ্চর্য করিতে পারিতেছে না।

সুভার বয়স ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। ক্রমে সে যেন আপনাকে আপনি অনুভব করিতে পারিতেছে। যেন কোনো একটা পূর্ণিমাতিথিতে কোনো-একটা সমুদ্র হইতে একটা জোয়ারের স্রোত আসিয়া তাহার অন্তরাত্মকে এক নূতন অনির্বচনীয় চেতনাশক্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। সে আপনাকে আপনি দেখিতেছে, ভাবিতেছে, প্রশ্ন করিতেছে, এবং বুঝিতে পারিতেছে না।

গভীর পূর্ণিমারাত্রে সে এক-একদিন ধীরে শয়নগৃহের দ্বার খুলিয়া ভয়ে ভয়ে মুখ বাড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখে পূর্ণিমাপ্রকৃতিও সুভার মতো একাকিনী সুগু জগতের উপর জাগিয়া বসিয়া— যৌবনের রহস্যে পুলকে বিষাদে অসীম নির্জনতার একেবারে শেষ সীমা পর্যন্ত, এমন— কি, তাহা অতিক্রম করিয়াও ধমধম করিতেছে, একটি কথা কহিতে পারিতেছে না। এই নিস্তন্ধ ব্যাকুল প্রকৃতির প্রাপ্তে একটি নিস্তন্ধ ব্যাকুল বালিকা দাঁড়াইয়া।

এ দিকে কন্যাভারগুস্ত পিতামাতা চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন। লোকেও নিন্দা আরম্ভ করিয়াছে। এমন-কি, এক-ঘরে করিবে এমন জনরবও শুনা যায়। বাণীকণ্ঠের সচ্ছল অবস্থা, দুই বেলাই মাছভাত খায়, এজন্য তাহার শত্রু ছিল।

স্ত্রীপুরাণে বিস্তর পরামর্শ হইল। কিছুদিনের মতো বাণী বিদেশে গেল। অবশেষে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, “চলো, কলিকাতায় চলো।”

বিদেশযাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল। কুয়াশা-ঢাকা প্রভাতের মতো সুভার সমস্ত হৃদয় অশ্রুবাশ্পে একেবারে ভরিয়া গেল। একটা অনির্দিষ্ট আশঙ্কা বশে সে কিছুদিন হইতে ক্রমাগত নির্বাক জম্বুর মতো তাহার বাপ-মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত— ডাগর চক্ষু মেলিয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া কী— একটা বুঝিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তাঁহারা কিছু বুঝাইয়া বলিতেন না।

ইতিমধ্যে একদিন অপরাহ্নে ছিপ ফেলিয়া প্রতাপ হাসিয়া কহিল, “কী রে সু, তোর নাকি বর পাওয়া গেছে, তুই বিয়ে করতে যাচ্ছিস? দেখিস আমাদের ভুলিস নে।” বলিয়া আবার মাছের দিকে মনোযোগ করিল।

মর্মবিদ্ধ হরিণী ব্যাধের দিকে যেমন করিয়া তাকায়, নীরবে বলিতে থাকে ‘আমি তোমার কাছে কী দোষ করিয়াছিলাম’, সুভা তেমনি করিয়া প্রতাপের দিকে চাহিল; সেদিন গাছের তলায় আর বসিল না; বাণীকণ্ঠ নিন্দ্রা হইতে উঠিয়া শয়নগৃহে তামাক খাইতেছিলেন, সুভা তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া বাণীকণ্ঠের গুচ্ছ কপোলে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

কাল কলিকাতায় যাইবার দিন স্থির হইয়াছে। সুভা গোয়ালঘরে তাহার বাল্য-সখীদের কাছে বিদায় লইতে গেল, তাহাদিগকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া, গলা ধরিয়া একবার দুই চোখে যত পারে কথা ভরিয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিল— দুই নেত্রপল্লব হইতে টপ টপ করিয়া অশ্রুজল পড়তে লাগিল।

সেদিন শুক্লাদ্বাদশীর রাত্রি। সুভা শয়নগৃহ হইতে বাহির হইয়া তাহার সেই চিরপরিচিত নদীতটে শম্পশয্যায় লুটাইয়া পড়িল— যেন ধরণীকে, এই প্রকাণ্ড মূক মানবতাকে দুই বাহুতে ধরিয়া বলিতে চাহে, ‘তুমি আমাকে যাইতে দিয়ো না মা, আমার মতো দুটি বাহু বাড়াইয়া তুমিও আমাকে ধরিয়া রাখো।’ □ [সংক্ষেপিত]

শব্দার্থ ও টীকা : **গর্ভের কলঙ্ক** – সন্তান হিসেবে কলঙ্ক। গর্ভ হলো মায়ের পেট। যে ব্যক্তি বা বস্তুকে পরিবারে নেতিবাচক হিসেবে দেখা হয় তা হলো কলঙ্ক। **সুদীর্ঘ পল্লববিশিষ্ট** – বড়ো পাতাবিশিষ্ট। এখানে চোখের পাতা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। **ওষ্ঠাধর** – ওষ্ঠ এবং অধর, উপরের ও নিচের ঠোঁট [ওষ্ঠ+অধর = ওষ্ঠাধর]। **কিশলয়** – গাছের নতুন পাতা। **তর্জমা** – অনুবাদ, এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তর। **অস্তমান** – ডুবন্ত, ডুবে যাচ্ছে এমন, চন্দ্র-সূর্যের পশ্চিম দিকে অদৃশ্য অবস্থা। **অনিমেষ** – অপলক, পলকহীন। **উদয়াস্ত** – উদয় + অস্ত = উদয়াস্ত, আবির্ভাব ও তিরোভাব, ওঠা ও ডুবে যাওয়া। **ছায়ালোক** – ছায়া + আলোক = ছায়ালোক। কোনো বস্তুর ওপর আলো পড়লে বিপরীত দিকে যে প্রতিবিম্ব হয় তা হলো ছায়া। **বিজন মহন্ত** – বিজন – জনশূন্য, নির্জন; **মহন্ত** – মহৎগুণ; বিজন মহন্ত – কোলাহলমুক্ত প্রকৃতির আকর্ষণীয় দিক। **তব্বী** – ক্ষীণ ও সুগঠিত অঙ্গবিশিষ্ট। **বাঁখারি** – কাঁধের দুদিকে দুপ্রান্তে বুলিয়ে বোঝা বহনের বাঁশের ফালি। **টেকিশালা** – যে ঘরে টেকি রাখা হয়। টেকি হলো ধান থেকে চাল তৈরির লোকজ যন্ত্র। এখনো গ্রামীণ জীবনে অনেক বাড়িতে টেকির ঘর আছে। **গার্হস্থ্য সচ্ছলতা** – পারিবারিক দৈনন্দিন জীবনের সচ্ছলতা। **চিরনিস্তব্ধ** হৃদয়

উপকূল – শান্ত হৃদয়। **ঝিল্লিরব পূর্ণ** – বিঁবি পোকার আওয়াজ/শব্দে মুখর। **বিজনমূর্তি** – নির্জন অবস্থা। **বিজন হলো নির্জন** বা **জনমানবশূন্য**, মূর্তি হলো কোনোকিছুর প্রতিকৃতি। **বিজনমূর্তি** শব্দটি এখানে কোলাহলহীন অবস্থা বা নির্জন/জনমানবশূন্য অবস্থা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। **গগুদেশ** – গাল। **মুক** – বধির, বোবা। **বিষাদশান্ত** – দুঃখমগ্ন, বিষাদ = স্মৃতিশূন্যতা, বিষণ্ণতা। **বিষাদশান্ত** হলো খুব বেশি বিষাদগ্রস্ততা থেকে যে শান্ত অবস্থা। **পূর্ণিমাতিথি** – চাঁদের পরিপূর্ণ রূপ হওয়ার সময়। **কন্যাভারগ্রস্ত পিতা-মাতা** – যে পিতা-মাতার বিবাহযোগ্য কন্যা সন্তানের বিয়ে হয়নি। **কপোল** – গাল। **নেত্রপল্লব** – চোখের পাতা। **শুক্রাষাদশী** – চাঁদের বারোতম দিন।

পাঠ-পরিচিতি : ‘সুভা’ গল্পটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত গল্পগুচ্ছ থেকে সংকলিত হয়েছে। বাক্যপ্রতিবন্ধী কিশোরী সুভার প্রতি লেখকের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা ও মমত্ববোধে গল্পটি অমর হয়ে আছে। সুভা কথা বলতে পারে না। মা মনে করেন, এ-তার নিয়তির দোষ, কিন্তু বাবা তাকে ভালোবাসেন। আর কেউ তার সঙ্গে মেশে না, খেলে না। কিন্তু তার বিশাল একটি আশ্রয়ের জগৎ আছে। যারা কথা বলতে পারে না সেই পোষা প্রাণীদের কাছে সে মুখর। তাদের সে খুবই কাছের জন। আর বিপুল নির্বাক প্রকৃতির কাছে সে পায় মুক্তির সনদ। ‘সুভা’ গল্পের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর মন ও চিন্তা, আবেগ ও অনুভূতির সূক্ষ্মতর দিকগুলো উপস্থাপন করেছেন। শিশুর এ ধরনের প্রতি সকলের মমত্বশীল দৃষ্টিভঙ্গি প্রস্তুতে সহায়তা করে এ গল্প।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১. বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধীর সাহায্য-সহযোগিতার জন্য কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়? এ বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করে শ্রেণিশিক্ষকের নিকট জমা দাও।
২. তোমার চারপাশের সমাজে সুভার মতো কারো জীবন-বাস্তবতা থাকলে তা নিজের ভাষায় লিখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ১। ছিপ ফেলে মাছ ধরা কার প্রধান শখ ছিল?

- | | |
|--------------|---------------|
| ক. সুভাষিনীর | খ. বাণীকণ্ঠের |
| গ. সুকেশিনীর | ঘ. প্রতাপের |

২। বাণীকণ্ঠের শুরু কপোলে অংশ গড়িয়ে পড়েছিল কেন?

- i. সুভাকে বিয়ে দেবেন বলে
- ii. সুভা কথা বলতে পারে না বলে
- iii. মেয়েটির ভবিষ্যৎ ভেবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

সেই ছোটবেলায় মর্জিনা একটি বিড়াল ও একটি কুকুর ছানা এনেছিল। নাম দিয়েছে পুষি আর পুটু। আজ পুষি আর পুটু পুরোপুরি বড়ো হয়েছে। নাম ধরে ডাকলে মুহূর্তেই হাজির হয়। পুষি কোলে উঠে বসে কিন্তু পুটু একটু দূরে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ায়

৩। মর্জিনার মধ্যে সুভার যে বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়, তা হলো—

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ক. ইতর প্রাণীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ | খ. একাকিত্বের সাথে ইতর প্রাণী |
| গ. ইতর প্রাণীর প্রতি মমত্ববোধ | ঘ. সবার থেকে নিজেকে আড়ালে রাখা। |

৪। উদ্দীপকের মূলভাব 'সুভা' গল্পের কোন বাক্যে প্রতিফলিত হয়েছে?

- i. দিনে তিনবার গোয়ালঘরে যাওয়া
- ii. দুই বাহু দ্বারা গলা জড়িয়ে ধরা
- iii. মাঝে মাঝে তাদেরকে ভর্তসনা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

দুই পুত্রসন্তানের পর কন্যাসন্তান পলাশ বাবুর পরিবারে আনন্দের বন্যা নিয়ে এল। নাম রাখা হলো 'কল্যাণী'। সকলের চোখের মণি কল্যাণী বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পলাশ বাবু বুঝতে পারলেন, বয়সের তুলনায় কল্যাণীর মানসিক বিকাশ ঘটেনি। কিছু বললে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। কল্যাণীর বিয়ের কথাবার্তা চলছে। পলাশবাবু কল্যাণীর অবস্থা বরপক্ষকে খুলে বললেন। সব শুনে বরের বাবা সুবোধ বাবু বললেন, 'পলাশ বাবু কল্যাণীর মতো আমার ছেলেও তো হতে পারত, কাজেই কল্যাণীমাকে ঘরে নিতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই।'

ক. সুভার গ্রামের নাম কী?

খ. 'পিতা-মাতার নীরব হৃদয়ভার' — কথাটি দ্বারা লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন?

গ. উদ্দীপকের প্রথম অংশের বক্তব্যে কল্যাণী ও সুভার যে বিশেষ দিকটির সঙ্গতি দেখানো হয়েছে, তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'কল্যাণী ও সুভা একই পরিস্থিতির শিকার হলেও উভয়ের প্রেক্ষাপট ও পরিণতি ভিন্ন' — বিশ্লেষণ কর।